আলোকিত মানুষ ▪ ৫

আব্বাস ইবনে ফিরনাস

মূল : সানা শালান
ভাষান্তর : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান

অনেক দিন আগের কথা। এক ছিলেন ছোট্ট বালক। তাঁর চোখ দুটি ছিল উজ্জ্বল চকচকে। ছেলেটির নাম আব্বাস। বাবার নাম ফিরনাস। বাবার নামের সাথে মিলিয়ে মানুষ তাকে ডাকত আব্বাস ইবনে ফিরনাস নামে। আব্বাস ইবনে ফিরনাসের জন্ম হয়েছিল ১৮০ হিজরিতে। তখন ছিল খলিফা হিকাম ইবনে হিশামের শাসনামল।

ছোটোবেলা থেকেই আকাশ আর পাখিদের প্রতি ছিল তার এক অনন্য টান। তিনি একমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ডানা মেলে পাখিদের উড়ে চলা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। আর রাতের বেলা তারাদের দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে থাকতেন।

মনে মনে ভাবতেন, কত সুন্দর করে পাখিরা উড়ে যায় দূর নীলিমায়। আমিও যদি উড়তে পারতাম পাখিদের মতো! যেতে পারতাম দূর আকাশের ওই

তারাদের দেশে!

এভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে দেখতে দেখতে তিনি নিজের অজান্তেই শিখে ফেলেন অনেক তারার নাম। আকাশের কোন জায়গায় কোন তারার অবস্থান, আঙুল দিয়ে তাও দেখিয়ে দিতে পারতেন। হঠাৎই তিনি পণ করে বসেন–আমিও উড়ব পাখিদের মতো। উড়ে চলব আপন মনে, মুক্ত আকাশে। কিন্তু মানুষের পক্ষে কি আদৌ ওড়া সম্ভব?

একদিন তিনি সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করছিলেন। হঠাৎ তার চোখ পড়ে একটি আয়াতের ওপর। যে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

> ‘হে জিন ও মানুষ, তোমরা যদি আকাশ ও জমিনের সীমানা অতিক্রম করতে পারো, তাহলে অতিক্রম করো। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া প্রমাণপত্র ছাড়া তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।’
>
> (সূরা আর-রহমান : ৩৩)

তিনি আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন। হঠাৎই আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করতে পেরে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে তার। কারণ, এ আয়াত সুসংবাদ দিচ্ছে–মানুষ শীঘ্রই আকাশে উড়তে সমর্থ হবে। তবে এজন্য একটি জিনিসের প্রয়োজন। আর তা হলো আল্লাহর দেওয়া প্রমাণপত্র। হৃদয়ে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আব্বাস ইবনে ফিরনাস চলে গেলেন তার উসতাজের কাছে।

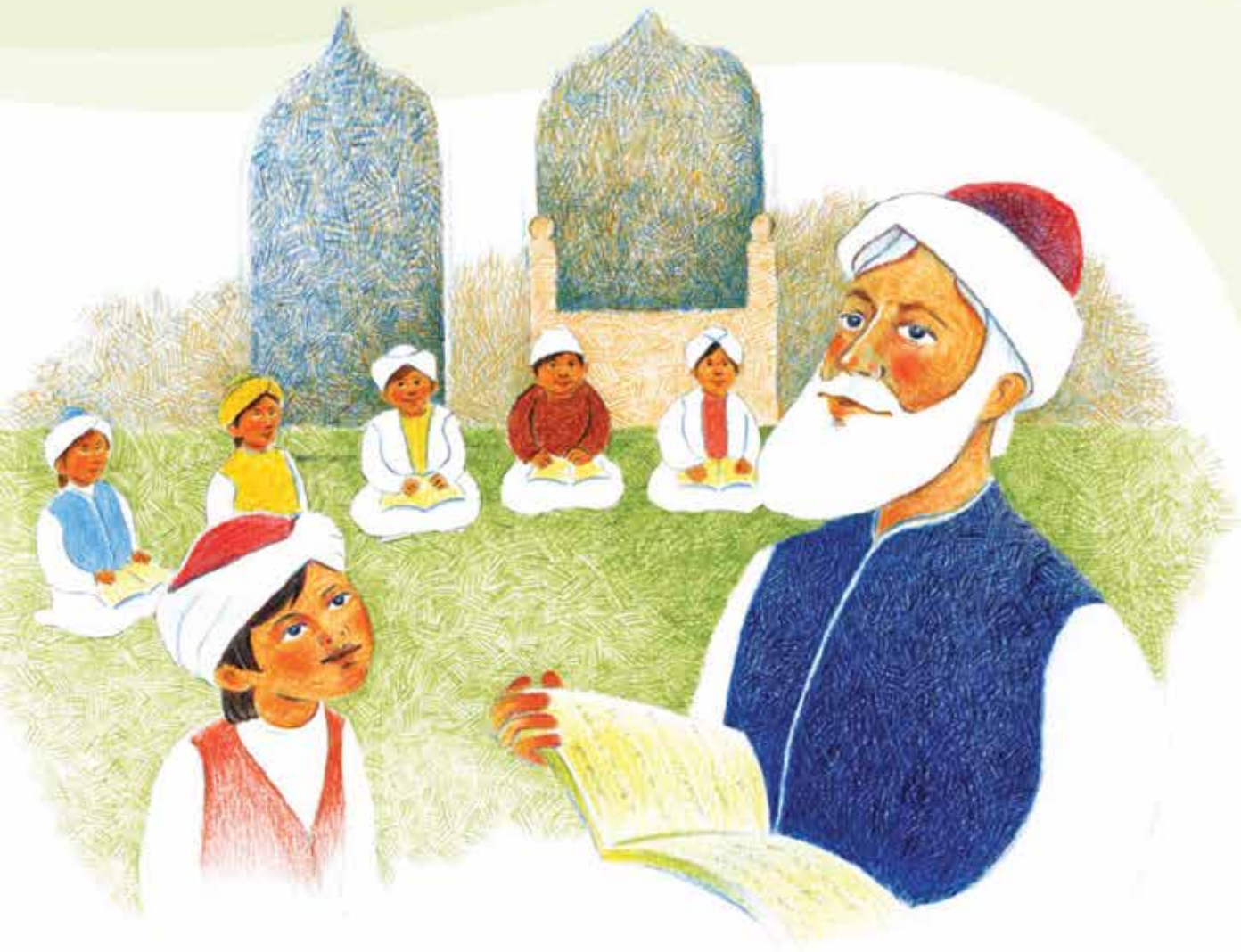

তিনি উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন–

মহামান্য উসতাজ, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কোন প্রমাণের কথা বলেছেন, যা পেলে মানুষ আকাশেও উড়তে পারবে?

আলোকিত মানুষ ▪ ২

খলিফা হারুনুর রশিদ

মূল : সানা শালান
ভাষান্তর : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান

পরবর্তী সময়ে এই ছোট্ট শিশু হারুন ইসলামি সালতানাতের খলিফা হয়েছিলেন। আর তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল হারুনুর রশিদ।

রাই। ইরানের রাজধানী তেহরানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছোট্ট এক শহর। ১৪৮ হিজরিতে এ শহরেই জন্মগ্রহণ করেন হারুনুর রশিদ। তিনি জন্মের পর চোখ খোলা মাত্রই নিজেকে আমির হিসেবে দেখতে পান। যাতে নিজেকে আব্বাসি খিলাফতের খলিফার মসনদে আসীন করতে পারেন।

জন্মের সময় তার বাবা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল মাহদি ছিলেন রাই ও খোরাসান শহরের একজন সামান্য আমির। মাহদির দাদা আবদুল্লাহ ছিলেন এ সময় আব্বাসি সালতানাতের খলিফা। সবার কাছে তিনি খলিফা আবু মানসুর নামে পরিচিত। দাদার মৃত্যুর পর তার বাবা হন আব্বাসি সালতানাতের চতুর্থ খলিফা।

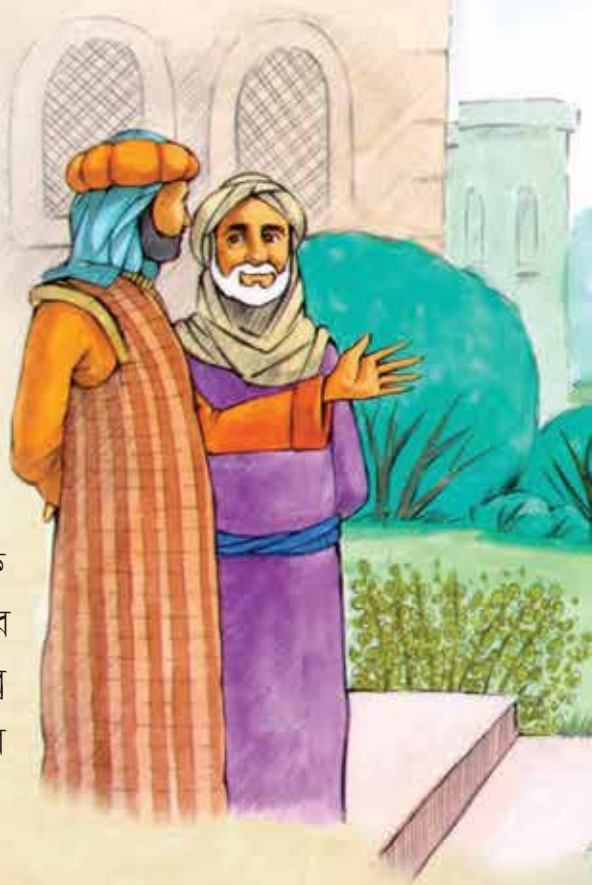

হারুনুর রশিদের শৈশব অন্যসব সাধারণ শিশুর মতো ছিল না। তার ভবিষ্যৎ কর্মও ছিল না অন্য সাধারণ শিশুদের মতো। বরং তার জন্য অপেক্ষা করছিল গুরুদায়িত্ব। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কারণে, অপেক্ষায় থাকা গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তাকে শৈশব থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। অপেক্ষায় থাকা সে দায়িত্বের নাম ছিল খিলাফত ও রাজত্ব। মুসলমানদের পরিচালনার দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা হারুনুর রশিদের ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছিলেন। তাকে দিয়েছিলেন সুন্দর চেহারা। প্রখর বুদ্ধিমত্তা। শেখার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তার হৃদয়ে দিয়েছিলেন আলিমদের

প্রতি এত এত ভালোবাসা, যা কল্পনাতীত। তার হৃদয় ছিল সিংহের।

ইসলামবিরোধীদের কঠোরহস্তে প্রতিরোধ করা তিনি পছন্দ করতেন। এসব দুর্লভ গুণ তার খলিফা হওয়ার পথ সুগম করেছিল। তার বাবাও এসব গুণকে সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

যে বয়সে শিশুরা খেলাধুলা করে, সে বয়সে হারুন সেনা ট্রেনিং নিয়েছেন। রপ্ত করেছেন যুদ্ধের কলাকৌশল। আর তাকে শিখিয়েছেন বড়ো বড়ো জাদরেল সেনা কমান্ডাররা। যাদের ঝুলি ছিল অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ আল বারমুকি, রবি ইবনে ইউনুস, ইয়াজিদ ইবনে মজিদ আশ-শায়বানি, হাসান আত-তায়ি, ইয়াজিদ ইবনে উসাইদ আস-সুলামি প্রমুখ।

তাদের প্রচেষ্টায় হারুনুর রশিদ একজন দক্ষ যোদ্ধা ও অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ারে পরিণত হন। যুদ্ধের সব কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেলেন। তিনি আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করেন, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করবেন।

খুব দ্রুতই তাকে গ্রীষ্মকালীন সামরিক বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। এ বাহিনী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালে আক্রমণ পরিচালনা করত। পরবর্তী সময়ে তাকে শীতকালীন সামরিক বাহিনীরও কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়।

এ দুটি দায়িত্ব পালনের সময় হারুনুর রশিদ অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। এরপর তার বাবা তাকে সম্পূর্ণ মরক্কো অঞ্চলের আমির তথা গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ইলমপিপাসু হৃদয়

হারুনুর রশিদ দ্বীন ইসলামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই সমস্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইলমচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর ইসলাম তো মানুষকে সর্বাত্মকভাবে ইলম অর্জনের প্রতিই উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে।

হারুনুর রশিদ ছিলেন একজন সত্যিকার সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। তার বাবা মাহদি তাকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য তার পাশে অনেক আলিমকে এনে উপস্থিত করেছিলেন। তারা তাকে শেখান শিষ্টাচার। আর তাকে করেন ভদ্র ও সুসভ্য। তাদের থেকে হারুন প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

আলোকিত মানুষ ▪ ১

ইবনে তাইমিয়া

মূল : সানা শালান
ভাষান্তর : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান

উর্বর ভূমিতে সব সময় ভালো গাছই জন্ম নেয়। উত্তম বৃক্ষের জন্ম হয়।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ছিলেন একটি উত্তম বৃক্ষ। তাঁর জন্ম হয়েছিল উর্বর ও পবিত্র জমিনে। কারণ, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক পরিবারে, ইলম ও ফিকহচর্চায় যাদের খ্যাতি ছিল দিগন্তজোড়া। তার বাবা, দাদা, ভাই, চাচা প্রমুখ সবাই হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। এমনকি তার মা ও নানিও ছিলেন আলেমা।

ইবনে তাইমিয়ার পরিবার মানুষকে ভালো কাজে আদেশ করার জন্য ছিল বিখ্যাত। তারা মানুষকে সৎকাজ করতে বলত। মন্দ কাজে নিষেধ করত। এই ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের কারণেই মূলত তার পরিবারকে বলা হতো তাইমিয়া। এখান থেকে তিনিও তাইমিয়া নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রকৃত নাম আহমাদ। তাঁর বাবার নাম ছিল আবদুল হালিম। দাদার নাম আবদুস সালাম। পরদাদার নাম আবদুল্লাহ ইবনে তাইমিয়া।

৬৬১ হিজরি সনের রবিউল আওয়াল মাসের ১০ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন ছিল সোমবার। ইংরেজি তারিখ ছিল ১২৬৩ সনের ১২ জানুয়ারি।

তার জন্ম হয়েছিল হাররান নামক এলাকায়। এলাকার প্রতি সম্বোধন করে তাকে হাররানিও বলা হতো। তৎকালীন সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি এলাকার নাম ছিল জাজিরাতু ইবনে উমর।

বাংলায় একে আমরা ইবনে উমরের উপত্যকা বলতে পারি। এই উপত্যকা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম ছিল হাররান।

বর্তমানে তা পূর্ব তুরস্কের অন্তর্গত বালিখ নদীর তীরবর্তী একটি স্থান। আর এই বালিখ হলো ফোরাতের একটি শাখানদী।

জন্মের পর মাত্র সাত বছর তিনি হাররানে বসবাস করেন। এরপর বাবার সাথে দামেশকে চলে আসেন। এ সময় দামেশকে ছিল আলিম ও মাদরাসার নগরী হিসেবে খ্যাত। অন্যদিকে হাররান মোঙ্গলদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সেখানের মানুষের ওপর মোঙ্গলরা অকথ্য জুলুম-নির্যাতন করত।

দামেশকে তিনি সর্বোত্তমভাবে প্রতিপালিত হন। উৎকৃষ্টভাবে বেড়ে ওঠেন। ইতোমধ্যেই তার মেধা, মনোযোগ ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে। তিনি সম্পূর্ণরূপে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেন। বাবার হাতেই তার পড়াশোনার হাতেখড়ি। এরপর সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমদের কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

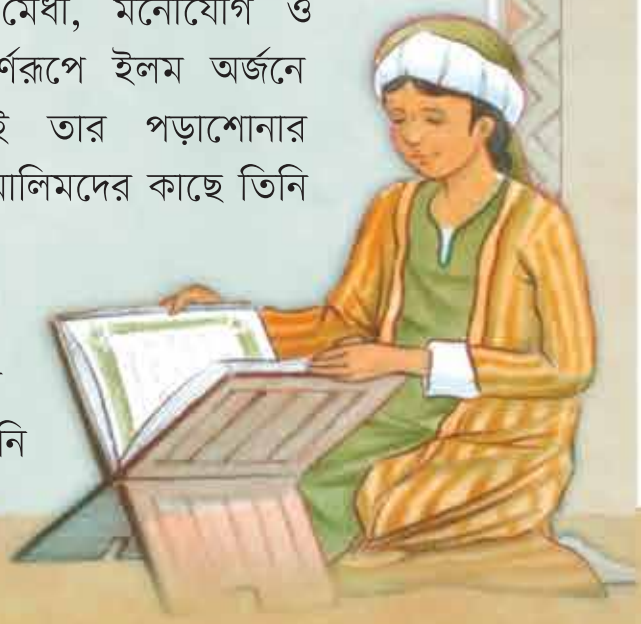

কথিত আছে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রায় দুশো আলিমের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন। প্রথমে তিনি কুরআন হিফজ করেন। এরপর তাফসির শেখেন। হাদিস মুখস্থ করেন।

সিরাতুন নবি অধ্যয়ন করেন। ফিকহ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, গণিত ইত্যাদি বিষয়েও পারদর্শিতা অর্জন করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাকে অগাধ মুখস্থশক্তি দিয়েছিলেন। তাকে

দিয়েছিলেন এমন একটি হৃদয়, যা সবকিছু সহজেই আয়ত্ত ও উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি বয়স ১০ বছর না হতেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠেন।

ইবনে তাইমিয়ার এই মুখস্থশক্তি দেখে তার শিক্ষকরা বিস্মিত হয়ে যান। একবার কোনো কিছু শুনলে তা তার মনে এমনভাবে গেঁথে যেত, যেন হৃদয়ে তার নকশা করা হয়েছে!

তার বয়সি অন্য ছেলেরা যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকত, তিনি তখন ইলমের মজলিসে মজলিসে সময় কাটাতেন। উসতাজদের থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। অথচ এতে সামান্যও বিরক্ত হতেন না। ক্লান্তিবোধও করতেন না। তার বয়স যখন মাত্র ১৭, তিনি নিজ সঙ্গীদের সবার মাঝে

আলোকিত মানুষ ▪ ৬

ইজ্জ ইবনে আবদুস সালাম

মূল : সানা শালান
ভাষান্তর : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান

সিরিয়ার রাজধানী দামেশক। আর দামেশক হলো ইতিহাস বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদের শহর। এ শহরে বাস করত এক দরিদ্র পরিবার। অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট সারাক্ষণ তাদের ঘরে লেগেই থাকত।

৫৭৭ হিজরি এ বাড়িতেই জন্ম হয় এক ফুটফুটে ছেলে সন্তানের। নাম রাখা হয় আবদুল আজিজ। তার বাবার নাম ছিল আবদুস সালাম। দাদার নাম কাসেম আদ-দিমাশকি। তবে মানুষের কাছে তিনি মুহাম্মাদ ইজ্জুদ্দিন আল মাগরিবি নামেই বেশি পরিচিত।

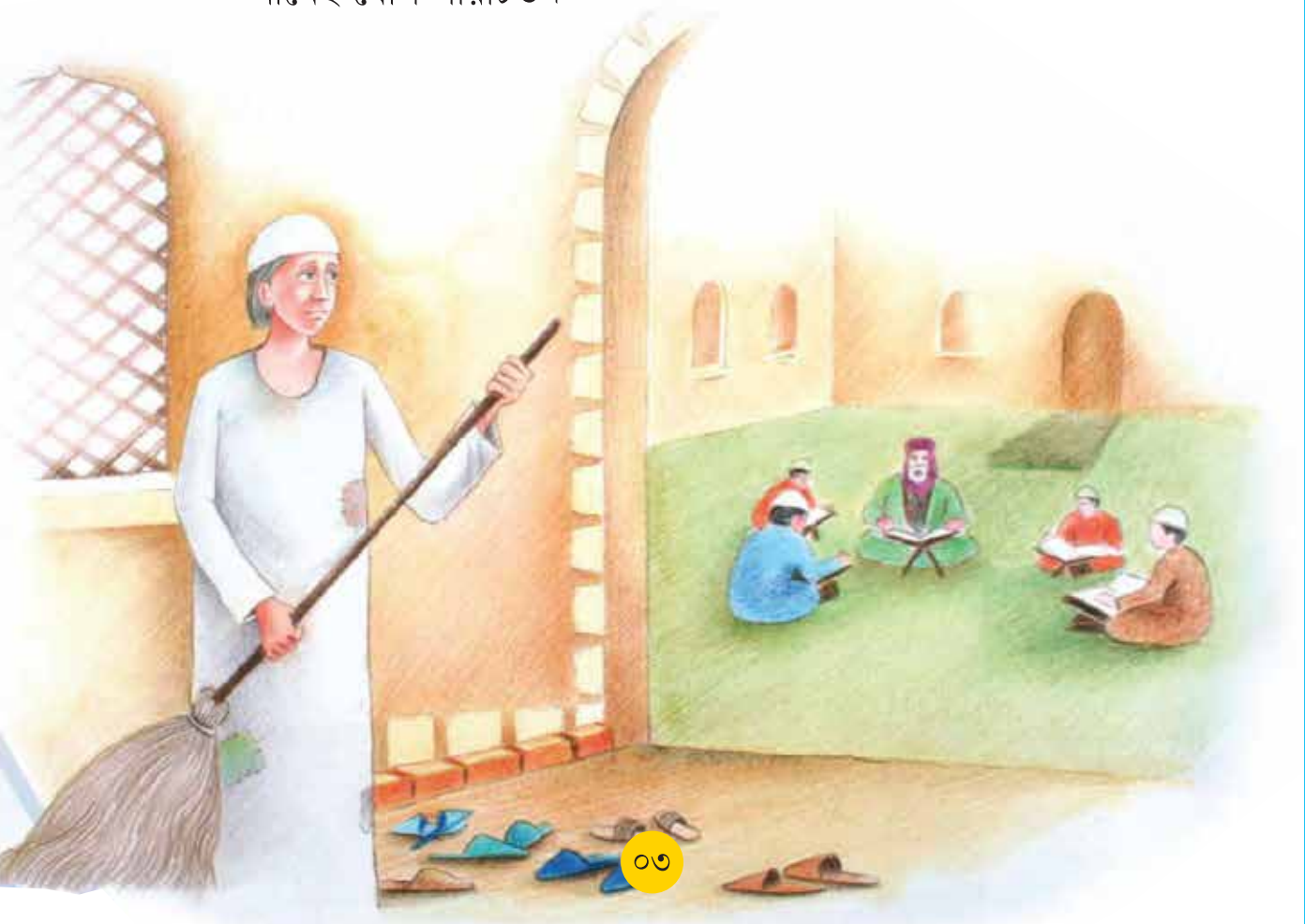

তার বাবা আবদুস সালাম ছিলেন একজন হতদরিদ্র মানুষ। কাজের খোঁজে প্রায়ই বাজারে ঘুরঘুর করতেন। সারাক্ষণ কাজ খুঁজে বেড়াতেন। কিন্তু কাজ পেতেন খুবই কম। আর মজুরিও পেতেন নামমাত্র।

শিশু আবদুল আজিজ দারিদ্র্যকে সঙ্গে নিয়েই বেড়ে ওঠেন। বালক বয়সে উপনীত হলে বাবা তাকে সঙ্গে করে কাজে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন ভারী বোঝা বহনের ক্ষেত্রে বাবাকে সহযোগিতা করতে পারেন। আর সাহায্য করতে পারেন বাজার ঝাড়ু দেওয়ার কাজেও।

বাবা দরিদ্র হলেও নামাজি ছিলেন। আজানের সাথে সাথে কাজ ফেলে উপস্থিত হতেন উমাইয়া মসজিদে। সঙ্গে নিয়ে যেতেন নিজের বালকপুত্র আবদুল আজিজকেও। বাপ-ছেলে একসাথে জামাতে নামাজ পড়তেন। ছেলের নামাজ পড়া দেখে বাবার হৃদয়ে বয়ে যেত এক অনাবিল প্রশান্তি।

একদিনের ঘটনা। আবদুল আজিজ বাবার সঙ্গে উমাইয়া মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি একজন আলিমের চোখে পড়ে যান। সেই আলিম বালক আবদুল আজিজের চেহারায় সুপ্ত প্রতিভার ঝলকানি দেখতে পান। বিশেষ করে তার মুচকি হাসিটা আলিমকে বেশি আকর্ষণ করে।

বালক আবদুল আজিজের মুখে সারাক্ষণ মুচকি হাসি লেগেই

থাকত। শত অভাব ও দারিদ্র্যের পীড়াও তার থেকে এই হাসি কেড়ে নিতে পারেনি।

এটি দেখে আলিম তাকে কাছে ডেকে নেন। তার জন্য বরকতের দুআ করেন।

প্রত্যেক দিন বালক আবদুল আজিজকে বাবার সাথে প্রচুর কায়িক পরিশ্রম করতে হতো। এর পরও তার চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। মুখাবয়বে ছিল অন্যরকম লাবণ্য। শরীর ছিল স্লিম। আজান হলেই ছুটে যেতেন মসজিদে। আর মসজিদে এলেই দুই শ্রেণির মানুষের অসংগতি ফুটে উঠত তার চোখে।

এক শ্রেণির মানুষ ছিল, যারা সমাজের বিত্তশালী। তারা ছিল ভোগবিলাসে মত্ত। দামি ও বিলাসী পোশাকে অভ্যস্ত। আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে নিজেদের সঙ্গে রাখত স্বর্ণখচিত তরবারি। উন্নত ঘোড়া তাদের বাহন। তারা অট্টালিকায় বসবাস করত। আর তাদের অট্টালিকার চারপাশ বিভিন্ন ফলফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা ছিল।

অন্য শ্রেণি ছিল ফকির। তারা দারিদ্র্যের মাঝে সারাক্ষণ ডুবে থাকত। কষ্ট ও শোকের মাঝেও তারা স্বপ্নে ছিল বিভোর। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে তারা একে অন্যের দিকে তাকাত। পরস্পর জিজ্ঞেস

করত, আমাদের মতো দরিদ্রদের কী অপরাধ? কী কারণে আমাদের ইলম থেকে বঞ্চিত হতে হয়? জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে থাকতে হয়?

প্রশ্নটি অত্যন্ত দুঃখভরা। বালক আবদুল আজিজ এ প্রশ্নের এমন কোনো উত্তর খুঁজে পেতেন না, যা তার মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। হৃদয়কে পরিতুষ্ট করতে পারে।

ইতোমধ্যে হঠাৎ করেই আবদুল আজিজের বাবা মারা যায়। এতে তার দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যায় আরও বহুগুণে। তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন এমন এতিম হিসেবে, যার থাকার কোনো ঘর নেই। আবার এমন কোনো হাতও নেই, যা তার মাথায় স্নেহ ও ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দিতে পারে।

আলোকিত মানুষ ▪ ৩

খলিল ইবনে আহমাদ

মূল : সানা শালান
ভাষান্তর : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান

এক ছিলেন বুদ্ধিমান বালক। তিনি ছিলেন সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও চৌকশ। তার নাম খলিল। পিতার নাম আহমাদ আমর। দাদার নাম তামিম আল ফারাহিদি। তিনি ওমানের বিখ্যাত ইয়াহমাদি বংশের আজদি শাখাগোত্রের মানুষ। ১০০ হিজরি সনে ওমানেই তার জন্ম হয়েছিল। অনেকেই আবার বলেন, তার জন্ম হয়েছিল বসরায়। বসরা ইরাকের বিখ্যাত একটি শহর।

কথিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর খলিলের বাবার নামই সর্বপ্রথম আহমাদ রাখা হয়েছিল।

বালক বয়সেই খলিল বসরায় চলে আসেন। সে সময় বসরা ছিল ইলমে নাহুর রাজধানী হিসেবে পরিচিত।

আচ্ছা, তোমরা কি জানো ইলমে নাহু কী? ইলমে নাহু এমন একটি বিজ্ঞান, যাতে আরবি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের শেষ বর্ণে হরকত কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চলো, আগের কথায় ফিরে যাই। বসরা ছিল ইলমে নাহুর রাজধানী। আর তাইতো আরবি ভাষাবিদ, তাফসিরশাস্ত্র-বিশারদ, হাদিসশাস্ত্র-বিশারদ প্রমুখ আলিমদের কেন্দ্রস্থল ছিল বসরা। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রদের এখানে সরব উপস্থিতি থাকত সব সময়। এমনকি আরবি সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকও এই নগরীতে বসবাস করতেন।

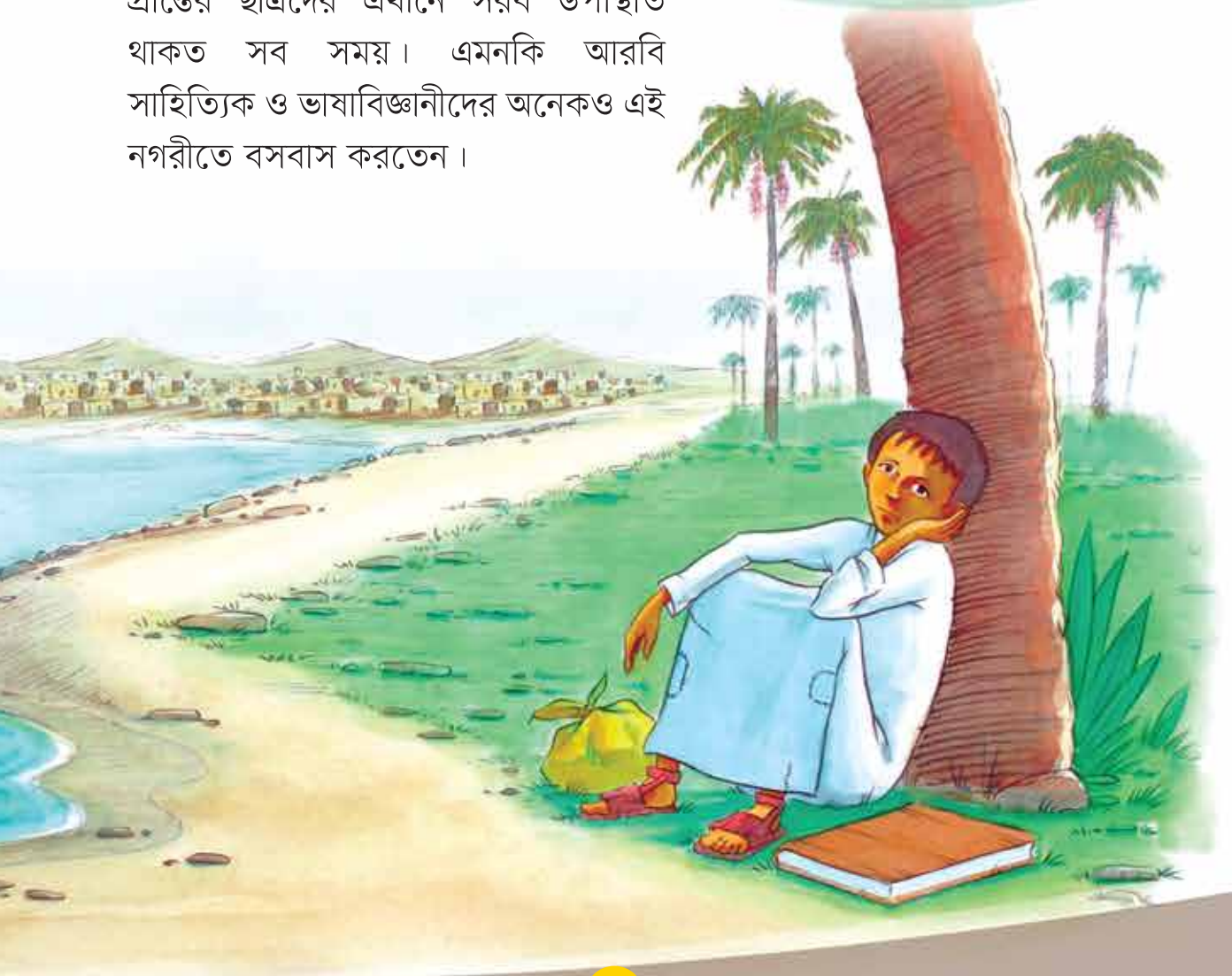

বসরার পরিবেশ ছিল জ্ঞানচর্চার জন্য অত্যন্ত উর্বর। ইসলামি ভূখণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল এই বসরা নগরী। ব্যক্তি এখানে চোখ খুললেই ওই ইলমের দেখা পেত, যা সে অর্জন করতে পছন্দ করে। যে ইলম তাকে সিক্ত ও অনুরক্ত করে।

বসরার ছাত্ররা ইচ্ছে করলেই নিজের পছন্দসই ইলমের পেছনে তার সবটুকু সময় ব্যয় করতে পারত। সমস্ত গুরুত্ব এর পেছনে পুঞ্জীভূত করতে সক্ষম হতো। সহজ কথায় বলতে গেলে, এ ইলমের জন্য উৎসর্গ করতে পারত নিজের জীবন।

বালক খলিলকে আল্লাহ তায়ালা অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলেন। তাকে অধিকারী করেছিলেন প্রচণ্ড মেধা ও বুদ্ধিমত্তার। তিনি যা কিছুই চোখ দিয়ে দেখতেন, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তা নিয়ে মনের মধ্যে যত প্রশ্নের সৃষ্টি হতো, তা জানার চেষ্টা করতেন। এরপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন।

আলোকিত মানুষ ▪ ৪

লাইস ইবনে সাদ

মূল : সানা শালান
ভাষান্তর : ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান

দক্ষিণ মিশরের ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম কালকাশান্দা। এর অবস্থান কায়রো থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে। এ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৯৪ হিজরিতে জন্ম হয় লাইস ইবনে সাদের। তার পরিবার ছিল অত্যন্ত সচ্ছল।

চারপাশে ফসলের মাঠ। অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা প্রকৃতি। নির্মল বাতাস বয়ে চলে সর্বক্ষণ। সর্বত্র। এটিই লাইস ইবনে সাদের গ্রাম। এ গ্রামেই তিনি বেড়ে ওঠেন।

বালক লাইস বাড়ির উঠানে বুক ভরে নিশ্বাস নেন। সুন্দর ও মনোরম প্রকৃতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। কিছু একটা খোঁজার জন্য তিনি চোখ তুলে তাকান। কিন্তু নিজের আশপাশে এমন কোনো বালকের দেখা পান না, যার সাথে তিনি খেলতে পারেন। যার সাথে দুষ্টুমি করে সময় কাটাতে পারেন। ঠিক যেমন তার বয়সি সব বালকেরা করে থাকে।

একদিন লাইস বরং সব শিশুকে গ্রামের মক্তবে দেখতে পান। তারা সেখানে লেখা শিখছে। পড়া শিখছে। কুরআন মুখস্থ করছে। ফলে এ মক্তবই তাকে আকর্ষণ করে। কেড়ে নেয় তার সবটুকু মনোযোগ। তার মনে তৈরি করে ইলমের প্রতি ভালোবাসা। জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহা। অজানাকে জানার উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

তিনি দেখছিলেন মক্তবে সবাই লিখছে, পড়ছে। কয়েকজন আবার কুরআনুল কারিমও মুখস্থ করছে। আর উসতাজ তাদের মাঝে বসে আছেন। তাদের শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন। আবার কেউ ভুল করলে তা শুদ্ধ করে দিচ্ছেন।

এমন দৃশ্য দেখে লাইস ঘরের দিকে এক দৌড় দিলেন। নিজের ছোট্ট দুই বাহু ভাসিয়ে দিলেন বাতাসে। যেভাবে পাখিরা বাতাসে ডানা উড়িয়ে দেয়। ঘরে এসেই তিনি খাতা ও কলম বগলদাবা করলেন।

এরপর আরেক দৌড় দিলেন মক্তবের উদ্দেশে। সবার অগোচরে চুপিসারে ঢুকে পড়লেন মক্তবে।

এরপর লাইস প্রস্তুতি নিলেন নিজের শিশুসুলভ নির্দোষিতা প্রমাণের। যাতে তিনি নির্মল হৃদয় নিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। মনে ইলমের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে পারেন। আর তা পরিপূর্ণ হয় পবিত্রতা আর ঈমানে। হৃদয়ে থাকে গভীর তৃষ্ণা ও পিপাসা। এই পিপাসা কেবল দ্বীনের জ্ঞান অর্জন দ্বারাই পরিতৃপ্ত হয়। পরিতুষ্ট হয়। আর এ জ্ঞানের মাধ্যমে গড়ে তোলা যায় আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তার ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা যায়। আর এমন আমল করা যায়, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি।

ছোট্ট বালক লাইস মক্তবের উসতাজের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি উপহার দিলেন। অন্যদের দিকে তাকিয়েও একই হাসি উপহার দিলেন। এরপর এই বলে নিজের পরিচয় দেওয়া শুরু করলেন–আমি লাইস। আমার আব্বুর নাম সাদ। দাদার নাম আবদুর রহমান আল ফাহমি। আব্বুর কাছে শুনেছি, আমার পরদাদা ইরানের আসবাহান শহর থেকে এ গ্রামে এসেছেন। আমরা আগে কায়েস ইবনে রিফায়ার আজাদকৃত